হর্ষ ঃ

প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক বাণভট্টের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ হর্ষবর্ধন নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা নামক নাটকত্রয়ীর রচয়িতা। প্রভাকরবর্ধন-যশোমতীর কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষ ৬০৬-৬৪৭ খ্রী. অবধি স্থাণ্বীশ্বরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। হর্ষ শুধুমাত্র বীর সাহসী ও রণনিপুণ রাজা ছিলেন এমন নয়, সাহিত্য-শিল্পেরও সেবক ছিলেন। শ্রী ও সরস্বতী তাঁকে সমভাবে বরণ করেছিলেন। তিনি সমকালীন বিদগ্ধ ও প্রতিভাধর সাহিত্যিক বাণের পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী ছিলেন, এই কারণে বহু কবি ও প্রাবন্ধিক তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাই পীযূষবর্ষ জয়দেব প্রসন্নরাঘব নাটকে এই কবিকে 'কবিতা-কামিনীর হর্ষ' আখ্যায় ভূষিত করেছেন; উদয়সুন্দরীকথায় সোড্ঢল তাঁকে 'গীর্হর্ষ' (অর্থাৎ কাব্যবাণী বা সরস্বতীর আনন্দদায়ী) অভিধা দিয়েছেন[৮]। রাজশেখর জানিয়েছেন যে রাজা হর্ষের সভায় আশ্রিত বিশিষ্ট বিদ্বানদের মধ্যে বাণ, ময়ূর ও মাতঙ্গদিবাকর সমধিক প্রখ্যাত। দশম শতকের কবি পদ্মগুপ্ত নবসাহসাঙ্কচরিত মহাকাব্যে শ্রীহর্ষকে বাণ ও ময়ূরভট্টের গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষকরূপে সাধুবাদ জানিয়েছেন। মম্মটভট্ট রচিত কাব্যপ্রকাশের 'কাব্যং যশসে অর্থকৃতে—' ইত্যাদি শ্লোকের (১|২) ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ টীকাকার নাগোজিভট্ট লিখেছেন যে ধাবক স্বরচিত কাব্যের জন্য শ্রীহর্ষের কাছে ধনসম্পদ লাভ করেছিলেন[৯]। রামচরিতকার অভিনন্দ রাজা শ্রীহর্ষের বিদ্বৎপ্রিয়তা ও বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন[১০]। ৭ম শতকের শেষপাদে ভারতে আগত চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং (Itsing) হর্ষপ্রণীত নাগানন্দ নাটকের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণে উল্লিখিত আছে যে, রাজা শীলাদিত্য বোধিসত্ত্ব জীমূতবাহনের কাহিনী নাটকায়িত করেছেন এবং সঙ্গীতাদির সহযোগে সেই নাটক

অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। দামোদর গুপ্তের (৯ম শত) কুট্টনীমত গ্রন্থে শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বাণভট্ট আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে আপন পৃষ্ঠপোষক বিদ্বান, মহামানী, রণনিপুণ শ্রীহর্ষ ও তাঁর বংশের কীর্তিকথা নিয়ে করে হর্ষচরিত কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে হর্ষের অসাধারণ কবিত্বশক্তির উল্লেখ আছে। আলোচ্য তিনটি নাটকেই নাটিকাকাররূপে শ্রীহর্ষের নামোল্লেখ ও তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করা হয়েছে। তাছাড়া ভাব, ভাষা ও গঠনশৈলীর বিচারে আলোচ্য নাটকগুলি একই নাট্যকারের লেখনীপ্রসূত এরূপ অনুমান সহজেই করা যায়। দশরূপকের টীকাকার ধনিক (১০ম শত) তিনটি নাটক থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুতরাং স্থাণ্বীশ্বরের অধিপতি শ্রীহর্ষ আলোচ্য নাট্যত্রয়ীর রচয়িতা একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। কাব্যপ্রকাশোক্ত ধাবক সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং নাটকগুলি যে বাণভট্টের রচনা নয় সেই বিষয়েও নিঃসন্দেহ।

প্রিয়দর্শিকা : উদয়ন ও প্রিয়দর্শিকার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে চতুরঙ্ক নাটিকা প্রিয়দর্শিকা রচিত। অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মা আপন কন্যা প্রিয়দর্শিকাকে বৎসরাজ উদয়নের হাতে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু কলিঙ্গরাজ প্রিয়দর্শিকার পাণিপ্রার্থী। দৃঢ়বর্মা যখন কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বৎসরাজ্যে যেতে উদ্যোগ করছেন, তখন কলিঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মাকে বন্দী করলে প্রিয়দর্শিকা বিন্ধ্যকেতুর আশ্রয় লাভ করলেন। কিন্তু বৎসরাজ উদয়নের সেনাপতি বিজয়সেন বিন্ধ্যকেতুকে পরাজিত করে রাজকুমারী প্রিয়দর্শিকাকে উদয়নের প্রাসাদে আনলেন। প্রিয়দর্শিকা আরণ্যিকা নামে ছদ্মবেশে অন্তঃপুরে উদয়নের মহিষী বাসবদত্তার পরিচারিকা নিযুক্ত হলেন। উদয়ন আরণ্যিকার রূপে আকৃষ্ট হলেন। ছদ্মবেশিনী প্রিয়দর্শিকাও রাজার প্রণয়ে ধরা পড়লেন। ঘটনাচক্রে উদয়ন-বাসবদত্তার বিবাহ অবলম্বনে রচিত একটি নাটকের অভিনয়ে উদয়ন ও ছদ্মবেশিনী প্রিয়দর্শিকা নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অংশগ্রহণ করলেন। পরস্পরের প্রণয় প্রগাঢ় হল। উভয়ের গোপন প্রেমের ঘটনা জানতে পেরে রাজরাণী পরিচারিকা আরণ্যিকাকে বন্দী করলেন। অবশেষে সমস্ত রহস্যের উদ্ঘাটন করা হল। সকলে জানলেন রাণীর পরিচারিকা আরণ্যিকা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই মাসীর রাজকন্যা প্রিয়দর্শিকা। রাণীর অনুমতি নিয়ে উদয়ন-প্রিয়দর্শিকার বিবাহের ভিতর দিয়ে ঘটনার সানন্দ পরিসমাপ্তি ঘটল।

নাগানন্দ : পঞ্চাঙ্ক নাটক নাগানন্দের কাহিনী হল বিদ্যাধর রাজপুত্র জীমূতবাহন ও সিদ্ধরাজকন্যা মলয়বতীর প্রেম, পরিণয় ও জীমূতবাহনের আত্মত্যাগ। কথাসরিৎসাগরে (১২শ তরঙ্গ) বর্ণিত জীমূতবাহনের অলৌকিক কাহিনী এর উৎস। শর্ত অনুসারে পক্ষিরাজ গরুড়ের খাদ্যরূপে প্রত্যহ একটি সাপকে এক নির্দিষ্ট পাথরের চাতালে অপেক্ষা করতে হত। দৈবক্রমে জীমূতবাহন সেই পাথরের ওপর সাপকে বিলাপ করতে দেখে দয়াপরবশ হয়ে সর্পকুলকে রক্ষার জন্য সঙ্কল্প করলেন; তারপর সেই বধ্যশিলায় সাপের পরিবর্তে স্বয়ং অপেক্ষা করতে লাগলেন। গরুড় ভুলবশতঃ তাকেই সাপ মনে করে ভক্ষণ করলেন, কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন। জীমূতবাহনের

অনুরোধে গরুড় সর্পভক্ষণ ত্যাগ করলেন। অর্ধমৃত জীমূতবাহন প্রাণত্যাগ করলেন, শেষে দেবী দুর্গার কৃপায় প্রাণ ফিরে পেলেন।

রত্নাবলী : শ্রীহর্ষের নাট্যত্রয়ীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রত্নাবলী নাটিকা। এই নাটিকার ঘটনাবিন্যাস প্রিয়দর্শিকার অনুরূপ। সিংহলরাজ বিক্রমবাহু আপন কন্যা রত্নাবলীকে বৎসরাজ উদয়নের হাতে অর্পণের জন্য জাহাজে করে পাঠালেন। পথিমধ্যে জাহাজডুবি হল; কৌশাম্বী নগরীর এক বণিক রাজকুমারীকে উদ্ধার করে 'সাগরিকা' নামে পরিচয় গোপন করে উদয়নের অন্তঃপুরে রাজমহিষী বাসবদত্তার হাতে সমর্পণ করলেন। একদা বসন্তোৎসবে প্রমোদ-উদ্যানে সাগরিকা ও উদয়ন দূর থেকে পরস্পরকে দেখে মদনের ফুলশরে জর্জরিত হলেন। তারপর সাগরিকা গোপনে এক চিত্রফলকে প্রণয়ী রাজার ছবি আঁকলেন; এই সময় রাণীর পরিচারিকা ও সাগরিকার বান্ধবী সুসঙ্গতা এসে সেই ফলকে সাগরিকার ছবি এঁকে দিলেন। কদলীকুঞ্জে ঐ চিত্রফলকসহ সাগরিকার সঙ্গে রাজার মিলন হল। অকস্মাৎ বাসবদত্তা সেখানে উপস্থিত হলে সাগরিকা গোপনে পলায়ন করলেন, কিন্তু বিদূষকের হাতে লুকিয়ে রাখা সেই চিত্রফলক অসাবধানতায় সবার সমক্ষে পড়ে গেল। সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পেল। বাসবদত্তা সাগরিকাকে অবরুদ্ধ করে সুসঙ্গতার দ্বারা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেন। বিদূষকের পরামর্শে সাগরিকা বাসবদত্তার ছদ্মবেশে মাধবীকুঞ্জে রাজার সঙ্গে গোপনে মিলনের জন্য প্রস্তুত হলেন। এদিকে কাঞ্চনমালা বিদূষকের গোপন চক্রান্ত বাসবদত্তার কাছে জানিয়ে দিলেন। বাসবদত্তা সেই অন্ধকার রাত্রিতে সঙ্কেত-কুঞ্জে উদয়ন-সাগরিকাকে হাতেনাতে ধরে ফেলার জন্য কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে নিয়ে মাধবীকুঞ্জে সাগরিকার পূর্বেই হাজির হলেন। উদয়ন বাসবদত্তাকে ছদ্মবেশিনী সাগরিকা ভেবে প্রণয়-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন। বাসবদত্তা আত্মপরিচয় দিয়ে স্বামীকে ভর্ৎসনা করতে করতে বিদায় নিলেন। অতঃপর বাসবদত্তার ছদ্মবেশে সাগরিকা সেই সঙ্কেতকুঞ্জে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে রাজাকে না পেয়ে মনোদুঃখে মাধবী লতার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। বিদূষক ও রাজা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে ভাবলেন বাসবদত্তা হয়ত ক্ষোভে অপমানে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছেন। রাজার প্রচেষ্টায় সাগরিকার প্রাণ বাঁচল। তারপর রাজার ভুল ভাঙল; সাগরিকার সঙ্গে তাঁর প্রিয়মিলন ঘটল। ঠিক এই সময় বাসবদত্তা আপন অভিমান বিসর্জন দিয়ে স্বামীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের আশায় পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে এলেন এবং দূর থেকে সাগরিকা ও রাজার প্রেমালাপ শুনতে পেলেন। এই ঘটনার পর ক্রুদ্ধা বাসবদত্তা সাগরিকাকে সকলের অজ্ঞাতে অন্তঃপুরের মধ্যেই অবরুদ্ধ করে মিথ্যা গুজব রটিয়ে দিলেন যে সাগরিকাকে উজ্জয়িনীতে পাঠানো হয়েছে। অবশেষে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে এক যাদুকর সকলের সমক্ষে এক অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে উদয়নের সাহায্যে সেই অগ্নিকাণ্ডের মধ্য থেকে সাগরিকাকে উদ্ধার করালেন। এমন সময় সিংহলরাজের মন্ত্রী (যিনি জাহাজডুবিতে প্রাণ হারিয়েছেন বলে সাধারণের ধারণা ছিল) হঠাৎ উদয়নের প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলেন। রাণী বাসবদত্তার সানন্দ অনুমতিতে সাগরিকা ও উদয়নের পরিণয়ে সুখান্ত সমাপ্তি ঘটল।

রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকার কাহিনী, ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, ঘাত-প্রতিঘাত ও পরিসমাপ্তি একই খাতে এবং একই কৌশলে বিন্যস্ত। প্রাচীন নাট্যসমালোচকদের কাছে রত্নাবলী অতি জনপ্রিয় নাটক। ধনঞ্জয়, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ নাটকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (পঞ্চ সন্ধি, পঞ্চ অবস্থা প্রভৃতি) বিশ্লেষণে রত্নাবলী থেকে বহু উদাহরণ দিয়েছেন। উদয়নকাহিনীর উৎস হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা। ভাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি নাট্যকারগণ প্রাচীন ও প্রচলিত কাহিনীকেই অল্পবিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন। অবশ্য রত্নাবলীর ঘটনাসংস্থাপনে যে ভ্রান্তিবিলাস পরিকল্পিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ দক্ষতা ও নাট্যগুণ সম্পূর্ণ বজায় আছে; কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে মৌলিকতার পরিচয় নেই। উদয়ন, বাসবদত্তা, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, বসন্তক, যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রায় গতানুগতিক। বহুবল্লভ রাজার গোপন প্রেমের রোমাঞ্চ, প্রণয়ের বঞ্চনা অপেক্ষা ঈর্ষা ও পত্নীকাতরতার ক্ষোভ, রাজান্তঃপুরের প্রমোদকক্ষে গোপন প্রেমের অভিসার, রাজ্যের ঘটনাবর্তে ও প্রয়োজনের তাগিদে পুরুষের বহুবিবাহ বিধির সহায়তার তারুণ্যোজ্জ্বল প্রণয়ের সুলভ সহজ পরিণতি প্রভৃতি রাজকীয় জীবনসুলভ সমস্ত উপাদানই নাট্যকার ব্যবহার করেছেন। নাগানন্দ নাটকটি জীমূতবাহনের অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত, তাই নায়কচরিত্রটি অতিমানবিক গুণে ভূষিত হওয়ার ফলে কাহিনীর নাট্যগুণ ব্যাহত হয়েছে। প্রকৃত নাট্যরসের অভাবে নাগানন্দ সার্থক নাটক হয়ে ওঠে নি। জীমূতবাহনের স্বেচ্ছানুবৃত্ত ঘটনায় যে করুণ উপাদান ছিল, নাট্যকার তার নাট্যগুণের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হন নি। সংস্কৃত নাটকে বিদূষক নৃপতি-নায়কের প্রণয়রসের প্রধান সহকারী এবং এই কর্তব্যের মধ্যে হাস্যরস (humour) অন্যতম উপকরণ। শ্রীহর্ষের বিদূষক চরিত্র অন্যান্য বিদূষক অপেক্ষা হাস্যরসে অধিক আকর্ষণীয়। প্রাচীন নাট্যসমালোচকদের আলোচনায় (দশরূপক, সাহিত্যদর্পণ) পঞ্চসন্ধি ও পঞ্চ অবস্থার বিশ্লেষণে রত্নাবলী থেকে প্রদত্ত উদাহরণগুলি দেখে মনে হয় নাট্যকার যেন নাট্যশাস্ত্রের বিধান সম্মুখে রেখে তারই অনুসরণে রত্নাবলীর নাট্যরূপ সম্পাদন করেছেন। প্রিয়দর্শিকা ও রত্নাবলীর বিন্যাসে দক্ষতার পরিচয় আছে, তবে উভয় রচনাই মৌলিকতাবর্জিত। জনপ্রিয় নাট্য উপাদানের সার্থক ব্যবহার এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলন ও সুখময় নাট্যপরিণতির চিত্রণে হর্ষের রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা যেমন পাঠক ও দর্শকসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, তেমনি নাগানন্দে প্রথম তিন অঙ্ক পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার আবেগমধুর প্রণয় এবং শেষ দুই অঙ্কে নায়কের আত্মত্যাগের মহিমা আদর্শ দৃশ্যকাব্যের মর্যাদা দান করেছিল। হর্ষের রচনায় কালিদাস, বাণভট্ট ও ভবভূতির প্রভাব অনস্বীকার্য*।

হর্ষের রচনারীতি সহজ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ; নিসর্গবর্ণনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়, তারুণ্যসুলভ প্রেমের উচ্ছ্বাস, রাজান্তঃপুরের ঈর্ষাকলুষিত প্রণয়ের মান-অভিমান ও দ্বন্দ্ব, বিরহ-বিচ্ছেদের করুণ আর্তি, সম্ভোগের মনোরম চিত্র প্রভৃতির বর্ণনায় নাট্যকার সার্থক কৃতী।

বিদূষকমুখে নবোঢ়ার লজ্জাকর ভাব—

দৃষ্টা দৃষ্টিমধো দদাতি, কুরুতে নালাপমাভাষিতা
শয্যায়াং পরিবৃত্য তিষ্ঠতি, বলাদালিঙ্গিতা বেপতে।
নির্যান্তীষু সখীষু বাসভবনান্নির্গন্তুমেবেহতে
জাতা বামতয়ৈব মেহদ্য সুতরাং প্রীত্যৈ নবোঢা প্রিয়া॥

রত্না. (Karmarkar) ৩/৪

একটি শ্লোকে নায়কের মুখে নায়িকার সৌন্দর্যের প্রশংসা—

কিং পদ্মস্য রুচিং ন হন্তি নয়নানন্দং বিধত্তে ন কিং
বৃদ্ধিং বা ঝষকেতনস্য কুরুতে নালোকমাত্রেণ কিম্।
বক্ত্রেন্দৌ তব সত্যয়ং যদপরঃ শীতাংশুরভ্যুদ্গতো
দর্পঃ স্যাদমৃতেন চেদিহ তদপ্যস্ত্যেব বিম্বাধরে॥

রত্না. ৩/১৩

তিনটি নাটক ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থ না পাওয়া গেলেও কোষকাব্যে শ্রীহর্ষের নামে কতিপয় মুক্তক শ্লোক সঙ্কলিত। ২৪ শ্লোকের সুপ্রভাত স্তোত্র এবং ৫ শ্লোকে অষ্টমহাশ্রীচৈত্যসংস্কৃতস্তোত্র নামক দুটি বৌদ্ধ স্তোত্র কবিতাও হর্ষের নামে প্রচলিত।

ভবভূতি :

নাট্যসাহিত্যে ভবভূতির গৌরবোজ্জ্বল অবদান কালিদাসের ন্যায় তাঁকেও সম্মানের অত্যুচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকগণ এই প্রথিতযশা নাট্যকারের সাহিত্য-প্রতিভাকে সশ্রদ্ধ স্বীকারে বরণ করেছেন। ভবভূতি তাঁর নাটকত্রয়ীর প্রস্তাবনায় সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—দক্ষিণাপথে পদ্মপুর নামে নগর ছিল; সেখানে কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখাধ্যায়ী কাশ্যপগোত্র পঙ্‌ক্তিপাবন পঞ্চাগ্নি-উপাসক ব্রতধর সোমপায়ী উদুম্বর-গোত্রনামা বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন। বাজপেয়যাজী সার্থকনামা মহাকবি ভট্টগোপালের পঞ্চম পৌত্র পবিত্রকীর্তি নীলকণ্ঠ-জাতুকর্ণীর পুত্র শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন ভবভূতি। কারও কারও অনুমান কবির যথার্থ নাম শ্রীকণ্ঠ, ভবভূতি তাঁর উপাধি। মালতীমাধবের পুষ্পিকায় নাট্যকারের নামের ক্ষেত্রে তিন রকম পাঠভেদ আছে—ভবভূতি, উম্বেকাচার্য এবং কুমারিলশিষ্য। তাই কেউ কেউ অনুমান করেছেন নাট্যকার ভবভূতি প্রকৃতপক্ষে কুমারিলশিষ্য উম্বেকাচার্য। ভবভূতি সে যুগের বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও কীর্তিমান নাট্যকার; বেদ, উপনিষদ, দর্শন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্বান। কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ করেছেন যে ভবভূতি ও বাক্‌পতি উভয় কবিই কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। স্বয়ং বাক্‌পতিরাজও গউড়বহো কাব্যে ভবভূতির রচনার প্রশংসা করেছেন। আচার্য বামন কাব্যালঙ্কারে অলঙ্কার নির্ণয় প্রসঙ্গে ভবভূতির শ্লোক উদ্ধার করেছেন। সোমদেব (৭ম শঃ), ধনঞ্জয় (৭ম শঃ), মম্মট (১০ম শঃ) প্রভৃতি গুণিজনও তাঁর শ্লোক উদাহরণরূপে উল্লেখ করেছেন। রাজশেখর (১০ম শঃ) বালরামায়ণে (১।১৬) ভবভূতিকে বাল্মীকির অবতাররূপে বর্ণনা

করেছেন। ভবভূতির নাটকের প্রস্তাবনা অনুসারে উজ্জয়িনীতে কালপ্রিয়নাথ মহাকালের উৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে নাটকগুলি অভিনীত হয়। নাট্যকারের কতিপয় উক্তি থেকে আমাদের মনে হয় তিনি সম্ভবতঃ প্রথম জীবনে রাজসভা সমাদরলাভে বঞ্চিত ছিলেন এবং তাঁর রচনাও সাহিত্যসেবী সমালোচকদের প্রশংসালাভে সমর্থ হয় নি[১৭]। তবে উত্তরকালে তিনি নিশ্চয় মনস্বী রাজা যশোবর্মার সৌহার্দ্য ও সমাদর পেয়েছিলেন। পূর্বোক্ত তথ্যের বিচারে নিঃসন্দেহে বলা যায় ভবভূতির জীবৎকাল ৬৫০-৭৫০ খ্রী.।

ভবভূতির তিনটি নাটক পাওয়া গেছে—মালতী-মাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত।

দশাঙ্ক প্রকরণ **মালতী-মাধব**[১৮] সম্ভবতঃ ভবভূতির প্রথম নাট্যপ্রয়াস। শৈথিল্য নাট্যকারের অপটু হস্তের সাক্ষ্য বহন করছে। নাট্যবস্তুর অসামঞ্জস্য, ভাষার অসংযম ও পরিমিতিবোধের অভাবে এই রচনা লক্ষণাক্রান্ত। বৃহদাকার এই প্রকরণের কাহিনী গতানুগতিক হলেও সার্থক নাট্যরূপ প্রদানে নাট্যকার সচেষ্ট। উজ্জয়িনীর মন্ত্রিকন্যা মালতীর সঙ্গে রাজ্যান্তর থেকে আগত তরুণ শিক্ষার্থী মন্ত্রিপুত্রের প্রণয় আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু। মালতীর পিতা নিজের মনোমত পাত্রের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক, বিবিধ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে মাধবের বন্ধু মকরন্দ এবং তাঁর পিতৃপরিচিতা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী কামন্দকীর কার্যকুশলতায় প্রেমের মিলনান্ত পরিসমাপ্তি ঘটল। মূল কাহিনীর সঙ্গে মালতীর প্রণয়প্রার্থী নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার সঙ্গে মকরন্দ নামক জনৈক তরুণের প্রণয়কাহিনীও যুক্ত। নাট্যকাহিনী তৎকালীন সাহিত্যের আসরে নিঃসন্দেহে অতীব জনপ্রিয় ছিল। নাট্যকার স্বয়ং বলেছেন, এই রূপকের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সরস ও রমণীয়, তাই মালতীমাধব একটি সার্থক নাটক[১৯]। তিনি যে সাহিত্যচর্চায় প্রথমাবধি মনে মনে উচ্চাশা পোষণ করতেন, তার দ্বিধাহীন আকাঙ্ক্ষা এই নাটকেই ব্যক্ত[২০]। প্রেমিকা-প্রেমিকার প্রণয়ের আবেগ, যৌবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাস, বিরহের আতিশয্য, কারুণ্যের আর্তি প্রকাশ, ভাবের মর্মস্পর্শী দ্যোতনায় নাট্যকার অতুলনীয়; প্রকৃতির সৌম্য-উগ্র রূপের বর্ণনায় ও শব্দচিত্র সার্থক শিল্পী এবং ভাব ও ভাষার আড়ম্বরে অত্যুৎসাহী। সম্ভবতঃ বৃহৎকথার অন্তর্গত কোনও কাহিনীর ভিত্তিতে আলোচ্য নাটকের আখ্যানভাগ পরিকল্পিত। অবশ্য নাট্যকাহিনীর গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। অষ্টম অঙ্কে (যেখানে রাজা মকরন্দের বীরত্বে প্রীত হয়ে মালতীর সঙ্গে তার বিবাহে সম্মত হলেন) নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটলে কাহিনী দুর্বলতামুক্ত হত। বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ অঙ্কের সাদৃশ্যে এই নাটকের দশম অঙ্কটি পরিকল্পিত। Macdonell মালতীমাধবের সঙ্গে Shakespeare-কৃত Romeo and Juliet নাটকে অঙ্কিত আবেগমধুর প্রণয়ের তুলনা করেছেন।

মালতীমাধবের ৬। ৭টির অধিক টীকা রচিত হয়েছে। টীকাকারগণ হলেন জগদ্ধর, ধরানন্দ, রাঘবভট্ট, ত্রিপুরারি, নারায়ণ, প্রাকৃতাচার্য প্রভৃতি।

মহাবীরচরিত[১৯] : সপ্তাঙ্ক নাটক মহাবীরচরিত, কিন্তু এর শেষ দুই অঙ্কের মূল রচনা পাওয়া যায় না[১৯]। মহাবীর রামচন্দ্রের (অথবা মহাবীর রাম, বালী, বালী, হনুমান, পরশুরাম প্রভৃতির) চরিত। যথার্থ বিচারে পূর্বরামচরিত নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত, কারণ নাট্যকার রামকেই মহাবীররূপে গণ্য করেছেন এবং তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের কাহিনীকে নাট্যবস্তুরূপে নির্বাচন করেছেন। কাহিনী—রাবণ কর্তৃক সীতাকে বিবাহের সঙ্কল্প এবং তদুদ্দেশ্যে দূতপ্রেরণ, রামের দ্বারা তাড়কার অপমান, রামকে হত্যার জন্য শূর্পণখা ও মন্ত্রী মাল্যবানের পরামর্শ এবং উভয়ের প্ররোচনায় পরশুরামের মিথিলায় উপস্থিতি ও রামকে অপমান; রাম ও পরশুরামের পরস্পরের অবমাননা ও আক্রোশ, মন্থরার ষড়যন্ত্রে শূর্পণখার মিথিলায় আগমন ও কৈকেয়ীর নামে রামকে জাল চিঠি প্রদান; সেই পত্রে দশরথের নিকট কৈকেয়ী কর্তৃক দুটি প্রার্থনা পূরণের অনুরোধ; রামের বনবাস-সঙ্কল্প, অরণ্যচারী রামের ক্রিয়াকলাপ; রাবণকর্তৃক সীতাহরণ, রাম কর্তৃক বালীবধ ও সুগ্রীবের বন্ধুত্বলাভ, রাবণমন্ত্রী মাল্যবানের আশাভঙ্গ; সীতার কাছে কামাতুর রাবণের প্রণয়ভিক্ষা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণের পরাজয় ও বিজয়ী রামসেনাদের উল্লাস; অবশেষে সীতাসহ রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যভার গ্রহণ। রামের বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য নাট্যকার প্রচলিত রামকাহিনীর অনেক মৌল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং রামসীতার চরিত্রে মানবীয় গুণ অপেক্ষা দেবসুলভ লোকোত্তর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভবভূতি রাবণ, মাল্যবান, বালী, সুগ্রীব, শূর্পণখা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন সত্য, কিন্তু যথার্থ নাট্যরস সৃষ্টিতে সফল হন নি। মালতীমাধবের ন্যায় বিন্যাসগত ত্রুটি না থাকলেও চরিত্রচিত্রণ ও নাট্যরসের আবেদনে এটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল নাটক। ভবভূতি এই নাটকে প্রাচীন সংস্কার ভেঙ্গে জনপ্রিয় ও চিরায়ত রামকথার বিন্যাসে কিঞ্চিৎ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু নাটকের উৎকর্ষসাধনে সেগুলি বিশেষ সহায়ক হয় নি। উপরন্তু সংস্কারপন্থী দর্শক ও বুদ্ধিজীবীরা নাট্যকারের এই স্বতন্ত্র সৃষ্টিভঙ্গির জন্য হয়ত অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন এমন অনুমান খুব দুঃসাহসিক নয় এবং হয়ত সেই কারণেই তাঁর জীবৎকালে নাটকগুলির জনপ্রিয়তা ছিল না। ভবভূতির আলোচ্য নাটকে দীর্ঘবিস্তারী বর্ণনা ও ভাষার আড়ম্বরে নাট্যগতি ব্যাহত; রাম ও পরশুরামের মধ্যে দুই অঙ্কব্যাপী বিবাদ-বিসংবাদ কবিত্বের নিষ্ফল শ্রমে পর্যবসিত। এই নাটকে সাহিত্যপরম্পরায় শৃঙ্গার রসের প্রথাসিদ্ধ একক প্রাধান্য অস্বীকার করে বীর রসকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা নাট্যকারের অভিপ্রেত[১৯]। ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও ভবভূতির মহাবীরচরিত ধ্রুপদী নাট্যরীতির সার্থক সৃষ্টি। ভবভূতি যে শৈলী অনুসরণ করেছেন, প্রথিতযশা নাট্যকারদের রচনায় তা সুলভ; তবে ভাষার আড়ম্বর, শিল্পিত মণ্ডনকলা এবং সার্বিক বৈচিত্র্যে তিনি অনন্যসাধারণ শিল্পী। আধুনিক সমালোচকগণ ভবভূতিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নি[১৯]।

মহাবীরচরিতে বীররাঘবকৃত (১৭৭০-১৮১৮ খ্রী.) টীকা প্রসিদ্ধ।

উত্তররামচরিত[১৯] : রামকথার উত্তরার্ধ অবলম্বনে রচিত সপ্তাঙ্ক নাটক উত্তরচরিত নিঃসন্দেহে ভবভূতির নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান এবং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অমূল্য

সম্পদ। মূলতঃ বাল্মীকির কাহিনীকে অনুসরণ করলেও নাট্যকার মহাবীরচরিতের মতো এখেও নাট্যপ্রয়োজনে অভীষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। নায়কের মনে দাম্পত্য প্রণয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে সামাজিক কর্তব্যবোধের দ্বন্দ্ব এই নাটকের উপজীব্য। তবে মহাবীরচরিতের ন্যায় এখানে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হয় নি। এবং এখানে তাঁর উদ্ভাবিত কাহিনীগুলি যেমন মৌলিক, নাট্যরসের বিকাশ ও সার্থক ক্রমপরিণতিতে তেমনি শৈল্পিক কৌশলে সুসংযোজিত।

কাহিনী ঃ ১ম অঙ্কের পূর্বার্ধে সীতার অবসর বিনোদনের জন্য চিত্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রামের সঙ্গে চিত্রদর্শন করতে করতে বিষণ্ণ সীতা নিদ্রিত হয়ে পড়েন, ইতিমধ্যে দূত দুর্মুখ এসে প্রজাদের মধ্যে সীতার চরিত্র সম্পর্কে কুৎসিত অপবাদের কথা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানাতে বাধ্য হলেন; রাম সীতাকে বিসর্জনের সিদ্ধান্ত করলেন। ২য় অঙ্কে সীতার নির্বাসনের পর বার বছর কেটে গেছে। তাপসী আত্রেয়ী ও বনদেবী বাসন্তীর কথোপকথনে জানা গেল রামচন্দ্র যজ্ঞ শুরু করেছেন, অন্যদিকে সীতার দুই পুত্র বাল্মীকির আশ্রমে পালিত হচ্ছেন। তারপর সশস্ত্র রাম শম্বুককে বধ করে অগস্ত্যের আশ্রমে এলেন। ৩য় অঙ্কে তমসা ও মুরলা নদীদ্বয়ের কথোপকথনে স্বামী-পরিত্যক্তা সীতার আত্মহত্যার সঙ্কল্প এবং গঙ্গা কর্তৃক সীতাকে রক্ষা ও তাঁর পুত্রদের বাল্মীকি-আশ্রমে প্রতিপালনের কথা জানা গেল। আশ্রমে ছায়াসীতা ও রামের সাক্ষাৎ হল, সীতার দুঃখে রামের মনোবিকলন ঘটেছে; অদৃশ্য সীতার স্পর্শে তিনি স্বাভাবিক চেতনা ফিরে পেলেন। ৪র্থ অঙ্কে জনক, কৌশল্যা প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে এসেছেন; সকলেই অসহায়া সীতার কথা আলোচনা করেছেন। এদিকে লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে আসছেন শুনে সীতার পুত্র লব তাকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হলেন। ৫ম অঙ্কে দুই বীর লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ চলতে লাগল; হঠাৎ রামের আবির্ভাবে উভয়ে ক্ষান্ত হলেন। রাম লবের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করলেন। এই সময় কুশ এলেন, তার হাতে বাল্মীকিরচিত কাব্য; সেই কাব্যের নাট্যরূপ প্রদানের পরিকল্পনা চলছে। ৬ষ্ঠ-৭ম অঙ্কে ভরতের পরিকল্পনামত অপ্সরাগণ নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন; নাটকের বিষয়বস্তু হল স্বামী-পরিত্যক্তা সীতার দুঃখদুর্দশা; অন্তঃসত্ত্বা সীতা আত্মহত্যার সঙ্কল্প করে ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিলেন; তারপর পৃথিবী ও গঙ্গা সীতাকে নিয়ে তার দুই শিশু সন্তানকে কোলে করে আবির্ভূত হলেন। পৃথিবী রামের কঠোরতার নিন্দা করলেন, কিন্তু ভাগীরথী রামকে সমর্থন করলেন। এই নাটক দেখতে দেখতে বিমূঢ় রাম কখনও অভিনয়ে বাধা দেন, কখনও সংজ্ঞা হারান। অবশেষে অরুন্ধতীর সঙ্গে সীতা মোহগ্রস্ত রামের সকাশে উপস্থিত হয়ে শুশ্রূষা করে তাঁকে প্রকৃতিস্থ করলেন। প্রজারা সানন্দে সীতাকে বরণ করলেন। বাল্মীকি লব ও কুশকে পিতামাতার হাতে অর্পণ করলেন।

আলোচ্য নাটকে কাহিনী-বিন্যাস, উদ্ভাবনী শক্তি, ঘটনার সংঘাতে মুখ্য চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং সব মিলিয়ে উত্তাপের নাট্যরসসর্জনায় ভবভূতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মৌলিক শিল্পী এবং সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। অনেকের

মতে ভবভূতি উত্তরচরিতে নাট্যবস্তুর সমগ্র পরিণতির দ্বারা একটি সার্থক নাট্যকাব্য সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু রামসীতার দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য একে 'psychological play' (মনস্তত্ত্বমূলক নাটক) বললেও অত্যুক্তি হয় না। আলেখ্য দর্শন ও ছায়া-সীতার পরিকল্পনা নাট্যকারের মৌলিক কল্পনার সার্থক রূপায়ণ। করুণরসের দীর্ঘস্থায়ী আবেগ কখনও কখনও মেলোড্রামার পর্যায়ে পৌঁছালেও ভাবের সমগ্র পরিণতি ও গীতিধর্মিতা পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে রাখে। মালতীমাধবে নায়ক-নায়িকার ঘটনা বাস্তবজগতের গণ্ডী অতিক্রম করে কল্পলোকের সংঘাতময় বিচিত্র আবর্তে প্রবিষ্ট। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা, কাপালিক প্রভৃতি অসাধারণ চরিত্রের সমাবেশ, নায়িকার অপহরণ, মৃত্যুমুখ থেকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা প্রভৃতি উপাদান কথাসাহিত্যের রাজ্য থেকে সরাসরি গৃহীত। ভবভূতির গভীর জীবনবোধ দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ লঘুবৃত্তি প্রদর্শনের পক্ষে মানসিক প্রতিবন্ধী হয়েছিল, তাই তিনি বিদূষক চরিত্রকে সর্বত্র পরিত্যাগ করে সরস লঘুতাকে পরিহার করেছেন; অন্যদিকে প্রণয়ের দুর্নিবার আবেগ, অবরুদ্ধ বাসনার প্রক্ষোভ, প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে ছিন্নবিচ্ছিন্ন অন্তরের সংঘাত, প্রেমের আত্মনিবেদন, সহনশীলতা ও নিষ্পাপ শুচিতার ভাবমূর্তি, তারুণ্যের দুর্জয় শক্তি, যুদ্ধের উন্মাদনা প্রভৃতি প্রকাশে তিনি সর্বত্র অতুলন। নিসর্গের সুন্দর-ভয়ঙ্কর, শান্ত-রৌদ্র রূপের চিত্রকল্প বর্ণনায় ভবভূতি বাণের তুল্য সার্থক। "করুণ প্রেমের অনিরুদ্ধ উৎসার, দাম্পত্য প্রণয়ের মহান আদর্শ, ত্যাগ ও দুঃখের অনলে অন্তরের বিশুদ্ধীকরণ"[১] ভবভূতির নাট্যকাহিনীতে সার্থকভাবে ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে। 'বশ্যবাক্ শ্রীকণ্ঠ' ভবভূতির মহতী বাণীর ভাবব্যঞ্জনায় আধুনিক পাঠকের ন্যায় প্রাচীনেরাও মুগ্ধ হয়েছিলেন[২]। কালিদাস ও ভবভূতির অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার দীপ্তিতে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য মহামূল্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। কোনও রসিক সমালোচক তাই সাহসভরে বলেছেন, 'কালিদাস ও অন্যান্যেরা কবি, ভবভূতি মহাকবি'[৩]। তাঁর নাটকে প্রায় ৩০ প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত। অন্যান্যদের তুলনায় ভবভূতির প্রাকৃত গদ্য কিছুটা দুর্বল এবং পুরোপুরি সংস্কৃতের ছায়ায় আশ্রিত; প্রাকৃত শ্লোক নেই। কালিদাসের ন্যায় তাঁরও বহু বাণী লোকোক্তির পর্যায়ে উন্নীত। ভবভূতির রচনারীতি সরল নয়, কখনও কখনও অতিজটিল; দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগে কখনও বা দুর্বোধ্য; সম্ভবতঃ তিনি স্বেচ্ছায় নাট্যরীতির মধ্যে মহাকাব্যিক শৈলীর মিশ্রণ ঘটিয়েছেন[৪]।

উত্তরচরিতের প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ হলেন—বীররাঘব, আত্মরাম, লক্ষ্মণসূরি, ভট্টোজি শাস্ত্রী, রামচন্দ্র, ঘনশ্যাম, রাঘবাচার্য, পূর্ণ সরস্বতী, নারায়ণভট্ট, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, অভিরাম, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি।

ভবভূতির রচনাশৈলীর উদাহরণে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত। একটি শ্লোকে বাক্-প্রশংসা—

কামান্ দুগ্ধে বিপ্রকর্ষত্যলক্ষ্মীং / কীর্তিং সূতে দুষ্কৃতং যা হিনস্তি।
তাং চাপ্যেতাং মাতরং মঙ্গলানাং / ধেনুং ধীরাঃ সূনৃতাং বাচমাহুঃ॥

উ. রা. ৫।৩০

অপর একটি শ্লোকে সীতার সান্নিধ্যে রামের অন্তরে গভীর প্রেমের আনন্দাতিশয্য প্রকাশিত—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সম্মীলয়তি চ॥ উ. রা. ১।৩৫

মালতীমাধবের একটি শ্লোকে মালতীর প্রেমে মুগ্ধ মাধবের চিত্তে আনন্দের উচ্ছ্বাস—

লীনেব প্রতিবিম্বিতেব লিখিতেবোৎকীর্ণরূপেব চ
প্রত্যুপ্তেব চ বজ্রলেপঘটিতেবান্তর্নিখাতেব চ।
সা নশ্চেতসি কীলিতেব বিশিখৈশ্চেতোভুবঃ পঞ্চভিশ্
চিন্তাসন্ততি-তন্তুজাল-নিবিড়স্যূতেব লগ্না প্রিয়া॥ মা. মা. ৫।১০

সরল স্বচ্ছন্দ ভাষা ও বিদগ্ধ ভাবসমৃদ্ধিতে তিনি যেমন অনায়াস, বাহ্য আড়ম্বর সৃষ্টিতেও তেমনি দক্ষ—

গুঞ্জৎ-কুঞ্জ-কুটীর-কৌশিক-ঘটা-ঘূৎকারবৎ-কীচক-
স্তম্বাড়ম্বর-মূক-মৌকুলি-কুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ। উ. রা. ২।২৯

অর্থগাম্ভীর্যের সঙ্গে শব্দাড়ম্বরের সমন্বয় সাধনের জন্যে তিনি কখনও কখনও পদ্যে ও গদ্যে উভয়ত্র ওজোগুণ ও শব্দালঙ্কারের সমাবেশ ঘটিয়েছেন—উচ্চণ্ড-বজ্রখণ্ডাবস্ফোটনপটুতর-স্ফুলিঙ্গবিকৃতিঃ উজ্জ্বলতুমুল-লেলিহান-জ্বালাসম্ভার-ভৈরবো ভগবান্ উষর্বুধঃ। উ. রা. ৬ষ্ঠ

অর্বাচীন নাট্যকার ও নাটক

ভট্টনারায়ণ ঃ

প্রাচীন কুলজী গ্রন্থ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও অনেকেই বঙ্গরাজ আদিশূর এবং বেদজ্ঞ পণ্ডিত নাট্যকার ভট্টনারায়ণকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তদ্বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। গৌড়বঙ্গের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বংশের কুলজী গ্রন্থসমূহে (রাজাবলী, বঙ্গরাজঘটক, দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ঘটককারিকা প্রভৃতি) ভট্টনারায়ণ সম্পর্কে নানান বিবরণ পাওয়া যায়। বঙ্গরাজ আদিশূর কান্যকুব্জের যে পাঁচজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে বহির্বঙ্গ থেকে এদেশে আনয়ন করেন, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ তাঁদের অন্যতম[১০৯]। আদিশূরের জীবৎকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। বামনের কাব্যালঙ্কারসূত্রে এবং আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকে বেণীসংহারের শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে[১১০]। ধনঞ্জয় দশরূপকে এই নাটকের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ সমালোচনা করেছেন। অলঙ্কার গ্রন্থগুলির সাক্ষ্য অনুসারে ভট্টনারায়ণের কাল ৮ম শতকের প্রথম দিকে অথবা তারও আগে; অপরদিকে একটি তাম্রশাসন অনুসারে ৮৫০ খ্রী. যথার্থ সময়। হিউয়েন সাঙের বিবরণে নেপালরাজ

অংশুবর্মার উল্লেখ আছে; সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা শূরসেন অর্থাৎ আদিশূর উক্ত অংশুবর্মার ভগিনীকে বিবাহ করেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে আদিশূরের কাল ৮৭৮ খ্রী.। সুতরাং অনুমান করা যায় আদিশূর ৭ম-৯ম শতকের মধ্যবর্তী কোনও কালে গৌড়বঙ্গের রাজা ছিলেন এবং ভট্টনারায়ণ তাঁরই সভাসদ ছিলেন।

বেণীসংহার[১১১] ঃ

মহাভারতের উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্বের প্রধান প্রধান কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্বক লাঞ্ছনা করলে ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে পাপাত্মা দুঃশাসনকে হত্যা করে তারই রক্তে রঞ্জিত হাত দিয়ে দ্রৌপদীর বেণী সংহার (অর্থাৎ বন্ধন) করবেন—এই কাহিনীকে ভিত্তি করেই নাটকটির নাম বেণীসংহার। অবশ্য নাট্যকার কতিপয় মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যেমন তৃতীয় অঙ্কে অশ্বত্থামা ও কর্ণের বিতর্ক, চার্বাক ও ধর্মের সংলাপ প্রভৃতি। বেণীসংহারের মূল কাহিনীটি ছোট; কিন্তু নাট্যকার মহাভারত-প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলিকে যথাযথ সন্নিবিষ্ট করে কিঞ্চিৎ মৌলিকতার পরিচয় দিলেও বহু ঘটনার বিন্যাসে নাট্যগতির স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত। আলঙ্কারিকদের মতে বেণীসংহার একটি সার্থক নাটক। সংস্কৃত নাটকে বীর রসকে অঙ্গী বা প্রধান রসরূপে উপস্থাপনার ঘটনা বিরল। বীররসপ্রধান নাটকের মধ্যে বেণীসংহার শ্রেষ্ঠ। বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনার বিস্তারে বীররসের প্রতিষ্ঠায় ভট্টনারায়ণের দৃষ্টিভঙ্গী মৌলিকতার দাবী করতে পারে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দ্বারা উদ্ভূত নাট্যরসের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তাঁর বিশেষ শক্তি ছিল, কিন্তু ঘটনাবিন্যাসে সুষ্ঠু পারিপাট্যের অভাব, জটিল রচনারীতি এবং ভাবের আতিশয্য সার্থক নাট্যরস সৃষ্টির পরিপন্থী হয়েছে। তাঁর রচনা গৌড়ী রীতির অনুসারী, সংলাপ অনেক সময় দীর্ঘবিস্তারী; সংস্কৃত ও প্রাকৃতে দীর্ঘসমাসের বাহুল্য লক্ষণীয়। মহাভারতীয় বীর পুরুষগণের চরিত্রচিত্রণে ভট্টনারায়ণ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—ভীমের শৌর্যবীর্য ও আত্মবিক্ষোভ, দুর্যোধনের আত্মম্ভরিতা, দ্রৌপদীর তেজস্বিতা, অশ্বত্থামার পিতৃভক্তিপরায়ণতা, যুধিষ্ঠিরের বীরত্ব ও ন্যায়বোধ প্রভৃতি নাট্যকার নিপুণভাবে পরিস্ফুট করেছেন। শেষাঙ্কে চার্বাকের পরিকল্পনায় অভিনবত্ব থাকলেও নাট্যপ্রয়োজনের বিচারে তা গুরুত্বহীন।

জগদ্ধর, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, তর্কবাচস্পতি, ঘনশ্যাম, লক্ষ্মণসূরি প্রভৃতি টীকাকারগণ রচিত বেণীসংহারের টীকা পাওয়া যায়।

বীররসের উপস্থাপনায় ভাব, ভাষা ও পরিমিতিবোধ নাট্যমর্যাদার উপযোগী হলেও নাট্যকার অনেক ক্ষেত্রে কবিকল্পনার আবেগে পরিমিতি ও সামঞ্জস্যবোধ বিসর্জন দিয়েছেন। নাটকের সহজ-সরল প্রকৃত নাট্যরস সৃষ্টিতে ভট্টনারায়ণ যে অতিশয় পারদর্শী ছিলেন, নাটকের সহজ-সরল শ্লোকগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নাট্যধর্মী সংলাপরচনায় ভট্টনারায়ণের বিশেষ দক্ষতা ছিল, একথা অনস্বীকার্য। তবে দীর্ঘ সংলাপ, অতিভাষণ, বর্ণনা ও চরিত্রের বাহুল্য প্রভৃতির জন্য বেণীসংহার সার্থক নাটক হয়ে উঠতে পারে নি।

শান্তিপ্রিয় যুধিষ্ঠির অতিযুক্ত এভাবে কৃষ্ণের প্রস্তাবমত কৌরবদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করলে ক্রুদ্ধ ভীম বললেন—

মথ্নামি কৌরবশতং সমরে ন কোপাৎ / দুঃশাসনস্য রুধিরং ন পিবাম্যুরস্তঃ।
সঞ্চূর্ণয়ামি গদয়া ন সুযোধনোরূ / সন্ধিং করোতু ভবতাং নৃপতিঃ পণেন॥
বেণী. (Devasthali) ১।১৫

অশ্বত্থামা কর্ণকে সূতপুত্র বলে ভর্ৎসনা করলে কর্ণ জবাব দিলেন—
সূতো বা সূতপুত্রো বা, যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্॥ বেণী. ৩/৩৭

বিশাখদেব ঃ

মুদ্রারাক্ষস নাটকে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় থেকে আমরা জানতে পারি বিশাখদত্ত বা বিশাখদেব মহারাজ ভাস্করদত্তের (নামান্তরে পৃথুর) পুত্র এবং সামন্ত বটেশ্বরদত্তের পৌত্র। আলোচ্য নাটকের ভরতবাক্যে রাজা চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ আছে; কিন্তু কোনও কোনও পুঁথিতে চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্তে 'অবন্তিবর্মা', 'দন্তিবর্মা' বা 'রন্তিবর্মা' পাঠান্তর পাওয়া যায়[১১০]। অবন্তিবর্মা নামধারী দুজন রাজার উল্লেখ আছে। প্রথম জন মৌখরিরাজ অবন্তিবর্মা, যাঁর পুত্র হর্ষবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেছিলেন; তাঁর রাজত্বকাল ৭ম শতক। সেই সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে হূণদের উপদ্রব ঘটে। অবন্তিবর্মা সম্ভবতঃ প্রভাকরবর্ধনের সহযোগী হয়ে হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হন[১১১]। অবন্তিবর্মা নামধারী অন্য এক রাজা (৮৫৫-৮৩ খ্রী.) কাশ্মীরে রাজত্ব করতেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত বিভিন্ন কারণে তাঁকে বিশাখদেবের পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করতে অসম্মত। দন্তিবর্মা নামধারী জনৈক পল্লবরাজ ৭৭৯-৮৩০ খ্রী. পর্যন্ত দক্ষিণভারতে রাজত্ব করেছিলেন; কিন্তু নানান যুক্তিতে 'দন্তিবর্মা' পাঠ গ্রহণযোগ্য নয়। অধিকাংশ পুঁথিতে 'চন্দ্রগুপ্ত' পাঠই পাওয়া যায় এবং অনেকের মতেই এটিই সমীচীন পাঠরূপে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল এই চন্দ্রগুপ্ত কোন্ রাজা? মুদ্রারাক্ষসের নায়ক মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত। তাহলে সেই মৌর্য চন্দ্রগুপ্তই কি বিশাখদেবের পৃষ্ঠপোষক[১১২]? সংস্কৃত নাটকের প্রচলিত রীতি অনুসারে এমন মত যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আধুনিক বিদ্বৎগণের মতে উক্ত চন্দ্রগুপ্ত হলেন প্রখ্যাত নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৭৬-৪১৩ খ্রী.)। ইনি সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেন এবং আক্রমণকারী বৈদেশিক ম্লেচ্ছদের দমন করেন। বিশাখদেবের নামে প্রচলিত 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত' নামক অপর নাটকে চন্দ্রগুপ্ত ও শকদের শত্রুতার উল্লেখ আছে[১১৩]। তাই কেউ কেউ অনুমান করেন বিশাখদেব দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক এবং তাঁর জীবৎকাল ৪র্থ-৫ম শতকে মধ্যবর্তী; অবশ্য এই মতও সর্বজনগ্রাহ্য নয়[১১৪]।

মুদ্রারাক্ষসের মূল কাহিনী পুরাণ-ইতিহাস-লোককথায় ক্ষুদ্রাকারে পাওয়া যায়। বিষ্ণু পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী—মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত মহাপদ্ম উপাধিধারী রাজা ও তাঁর আট পুত্র (অর্থাৎ নবনন্দ) একশ বছর সাম্রাজ্য শাসন করবেন, কৌটিল্য

এই নন্দ বংশকে ধ্বংস করবেন। নাট্যকার বৃহৎকথাশ্রিত কথাসরিৎসাগরের আখ্যান সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন—কূটকৌশলী ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্য শকটালের সহযোগিতায় গোপন অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা সপুত্র নন্দকে নিধন করেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান থেকে অনুধাবন করা যায় যে প্রাচীন ভারতে নন্দ বংশের উচ্ছেদ ও মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকারী ঘটনা। চন্দ্রগুপ্ত কূটনীতি চাণক্যের কৌশলে এবং পার্বত্য নৃপতি পর্বতকের সহায়তায় নন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন এবং তারপর দিগ্বিজয় করে হিন্দুকুশ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইনিই প্রাচীন ভারতের প্রথম সার্বভৌম সম্রাট। হেমচন্দ্রের রচনাতেও নন্দ ও মৌর্যদের অনুরূপ ইতিহাস বর্ণিত। কিন্তু মুদ্রারাক্ষসের সামগ্রিক কাহিনীর যথার্থ উৎস কি তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আমাদের অনুমান বিশাখদেব নন্দ ও মৌর্যদের ঐতিহাসিক বিবরণ এবং তৎকালে প্রচলিত লোকশ্রুতি অবলম্বন করে এই নাটক রচনা করেছিলেন।

সপ্তাঙ্ক নাটক **মুদ্রারাক্ষস**[১১৫]। চাণক্য কূটকৌশলে নামমুদ্রা-চিহ্নিত আংটি হস্তগত করে মিথ্যা ছলনায় রাক্ষসকে নন্দদের পক্ষ ত্যাগ করে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য করেন। তাই নাম হয়েছে মুদ্রারাক্ষস অর্থাৎ মুদ্রার ছলনায় পরাজিত বা বিপক্ষ থেকে স্বপক্ষে আনীত রাক্ষস।

সংস্কৃত সাহিত্যে বীররসপ্রধান স্ত্রীভূমিকাবর্জিত একমাত্র নাটক মুদ্রারাক্ষস। নন্দবংশ ধ্বংসের পর মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর বিচক্ষণ কূটকৌশলী মন্ত্রী চাণক্য কর্তৃক নন্দদের অনুগত বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে আনয়নই নাট্যকাহিনীর মূল বক্তব্য। নন্দমন্ত্রী রাক্ষসও চন্দ্রগুপ্তকে স্বরাজ্য থেকে উচ্ছেদের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন পর্বতক নামক পার্বত্য রাজার পুত্র মলয়কেতু ও অন্যান্য কতিপয় রাজা। চাণক্যের গুপ্ত দূত ভাগুরায়ণের কূট-চক্রান্তে রাক্ষস ও মলয়কেতুর বিরোধ বাধল এবং রাক্ষস বারবার স্বকার্যসাধনে ব্যর্থকাম হলেন। চাণক্য ও রাক্ষস এবং চন্দ্রগুপ্ত ও মলয়কেতু পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভাগুরায়ণ ও সিদ্ধার্থক চাণক্যের গুপ্তচর এবং বিরাধগুপ্ত ও শকটদাস রাক্ষসের গুপ্তচর। কূটকৌশলে চাণক্য জয়ী হলেন; তাঁর প্রতিপক্ষ রাক্ষস অগ্রোপায় হয়ে প্রিয়বন্ধু ও পরিজনদের প্রাণরক্ষার অনিচ্ছাসত্ত্বেও চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিপদ গ্রহণে সম্মত হলেন। চাণক্যের কূট রাজনীতির বিজয়ের সঙ্গে নাটকের পরিসমাপ্তি সূচিত হল[১১৬]।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি বৃহদাকার রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হল লৌকিক বা অলৌকিক প্রণয়কাহিনী। কিন্তু বিশাখদেব সেই প্রচলিত ও জনপ্রিয় প্রথা বর্জন করে নতুন আঙ্গিকে এই নাটকটি উপস্থাপিত করেছেন; সমগ্র কাহিনীই রাজনৈতিক সংঘাতময় কুটিল আবর্তে গ্রথিত। শৃঙ্গার অথবা বীর এর মুখ্যরস তো নয়ই, শৃঙ্গার সম্পূর্ণ বর্জিত এবং সমগ্র নাটকে একটিমাত্র সাধারণ স্ত্রীচরিত্র (শকটদাসকে বধ্যভূমিতে আনয়নকালে তাঁকে অনুসরণকারিণী তাঁর শোকার্তা স্ত্রী) মঞ্চে ক্ষণিক উপস্থিত। অন্যদিকে হাস্যরসের প্রধান আশ্রয় বিদূষক চরিত্রের এবং সমগ্র কাহিনীতে হাস্যরসের অভাব এর

অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নাটকার বহু চরিত্রকে ঘিরে চাণক্য ও রাক্ষস নামক দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রকে নানান কুটিল চক্রান্তপূর্ণ ঘটনার দ্বারা এমন রহস্যঘন করে তুলেছেন যে নাটক পড়তে পড়তে মনে হয় কোনও রুদ্ধশ্বাস লোমহর্ষক গোয়েন্দা কাহিনীর প্রেক্ষাপট। নাটকার লঘুচপল বৃত্তিগুলিকে বর্জন করেছেন, তাই বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক অথবা চটুল পরিহাস কোনও কিছুই আমল দেননি। দুটি মুখ্য চরিত্র—চাণক্য ও রাক্ষস—উভয়েই ধুরন্ধর, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, শাসনক্ষমতায় দক্ষ, একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ী; কিন্তু চাণক্য ধীর-স্থির, স্থিতপ্রজ্ঞ, সদাসতর্ক এবং আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়নির্ভর; তাঁর তুলনায় রাক্ষস অপেক্ষাকৃত কোমলপ্রাণ, ক্বচিৎ অসতর্ক, কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণ এবং সঙ্কটময় মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসে সন্দেহপ্রবণ। রাক্ষসের চরিত্রে সাধারণ প্রবণতা কখনও বা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু চাণক্যের ক্ষুরধার শাণিত বুদ্ধির নিকট সকলেই বিমূঢ়। নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলিও স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

মুদ্রারাক্ষসে দৃশ্যকাব্যের গীতিধর্মিতার পরিবর্তে ওজস্বী ভাষার গ্রন্থনায়, রাজনীতির রোমাঞ্চকর ঘাত-প্রতিঘাতে নাট্যবস্তু এমনভাবে বিন্যস্ত যেন দাবার কূট চালের মত আদ্যন্ত পরিচালিত। ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ভাসের প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের কূটনীতি-আশ্রিত ঘটনার সঙ্গে এই নাটকের তুলনা চলে; কিন্তু পারস্পরিক চক্রান্ত, বিষপ্রয়োগে জীবননাশ, শাণিত বুদ্ধির প্রয়োগ, কূটচাল ঘটনার জটিলতা প্রভৃতির বিচারে বিশাখদেব তুলনাহীন। কোনও কোনও সমালোচক সাহিত্যের আদর্শগত বিচারে নাট্যকারকে নীতিভ্রষ্টতার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। অবশ্য রাজনীতির আদর্শবিচারে বিষপ্রয়োগ বা গুপ্তহত্যা স্বীকৃত হলেও নাট্যকার সমাজবিধিকে অগ্রাহ্য করে রাজনীতির নীতিহীন ভ্রষ্টাচারকে আদর্শরূপে গ্রহণ বা প্রচার করেছেন একথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

আলোচ্য নাটকের ৭টির অধিক টীকা রচিত হয়েছে। বটেশ্বর মিশ্র এবং ঢুণ্ডীরাজের টীকা (১৭১৩ খ্রী.) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। বটেশ্বর তাঁর টীকায় সমগ্র নাট্যকাহিনীর দ্বিবিধ অর্থের ইঙ্গিত দিয়েছেন—একটি সাধারণ, অপরটি রাজনীতিসাপেক্ষ অর্থ।

অনেকের অনুমান দেবী-চন্দ্রগুপ্ত ও অভিসারিকাবঞ্চিতক নামক নাটকদ্বয় এই নাট্যকারেরই রচনা। অবশ্য উক্ত নাটকগুলি পাওয়া যায় না। অন্যান্য গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে দেবী-চন্দ্রগুপ্তের কাহিনী অনুযায়ী গুপ্তবংশীয় রাজা রামগুপ্ত জনৈক শকরাজার ভয়ে আপন পত্নী ধ্রুবাদেবীকে তার হাতে অর্পণ করতে মনস্থ করেন; কিন্তু রাজভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত ধ্রুবাদেবীর ছদ্মবেশে শকরাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে অতর্কিত আক্রমণে তাকে হত্যা করেন। হর্ষচরিত ও কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে এই রাজনৈতিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। (অরিপুরে চ পরকলত্রকামুকম্ কামিনীবেশগুপ্তঃ চন্দ্রগুপ্তঃ শকনৃপতিম্ অশাতয়ৎ—হর্ষচরিত)। নাট্যদর্পণে আলোচ্য নাটকের উদ্ধৃতি এবং রাজনীতি-বিষয়ক কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। উদয়নকথা অবলম্বনে রচিত নাটক অভিসারিকাবঞ্চিতক। নাট্যশাস্ত্রের অভিনব-ভারতী টীকায় এবং শৃঙ্গারপ্রকাশে এই নাটকের উদ্ধৃতি ও উল্লেখ পাওয়া যায়। মুদ্রারাক্ষসের ন্যায় উক্ত দুটি নাটকের মূল কাহিনীও সম্ভবতঃ রাজনীতি সম্পর্কিত ছিল।